ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, সংখ্যা ৪১, ১৪২৯-১৪৩০/২০২১-২০২৩, ১-১৪
DOI: https://doi.org/10.59815/isp.vol4101

প্রাচীন বাংলার প্রত্ন-স্থাপত্যের বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষণ

ড. মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস
সহযোগী অধ্যাপক, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগ, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়।

Abstract: Although ancient Bengal is rich in history and heritage, it is possible to know only partial history due to insufficiency of sources. In the absence of reliable written information about ancient Bengal history, archaeological sources can be considered as sources of historiography. Archaeological sources prove that before the historical era, there was human migration in Bengal. Artifacts of the prehistoric period are found in Bengal, but as no formal excavations have been carried out, it is not possible to give detailed and accurate details on this subject. Even during the Maurya, Shunga and Kushan eras, it was not possible to know much about the history of Bengal. An inscription from the reign of Emperor Ashoka in the Maurya period and terracotta plaques from the Shunga period have been found in Mahasthangarh excavations. According to the sources found in archaeological excavations, it can be said that ancient Bengal was rich in archeological edifices. However, very few archetypes exist today. An idea about the various variations of ancient buildings can also be obtained from the identification of this glorious chapter of ancient Bengal from archaeological findings, discoveries and literary sources. A picture of society, culture, religion and economic conditions of ancient Bengal is also revealed through archaeological edifices. Archaeological discoveries of ancient architecture has added an important chapter as a crucial source for studying the history of ancient Bengal. In this article we will present various aspects of important chapters of cultural life through building materials, techniques and varied decorative styles.

Key Words: Archaeological-edifices, Ancient Bengal, History and Heritage.

বাংলায় মানুষের বসবাস ঠিক কবে শুরু হয়েছে তা সঠিকভাবে বলা সম্ভব নয়। লিখিত উৎস খণ্ডিত আকারে আমাদের যে ধারণা দেয় তারও সম্পূর্ণ ইতিহাস জানা সম্ভব হয়নি। প্রাচীনকালের ইতিহাস সম্পর্কে লিখিত নির্ভরযোগ্য তথ্যের অভাবে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎস ইতিহাস রচনার উৎস হিসাবে বিবেচিত হতে পারে। মধ্যযুগ পূর্ব বাংলার গৌরবময় ইতিহাস বিনির্মাণে প্রত্নসূত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে এরূপ ইঙ্গিত প্রদান করে যাচ্ছে। সম্প্রতি প্রত্নতাত্ত্বিক চর্চার মাধ্যমে আবিষ্কৃত নিদর্শনের আলোকে প্রাচীন বাংলার ইতিহাস-ঐতিহ্য সম্পর্কে কিছুটা হলেও ধারণা লাভ করা যায়। বাংলা প্রত্ন সম্পদে সমৃদ্ধ অঞ্চল হলেও প্রত্নতাত্ত্বিক কর্মকাণ্ড অনেক দেরিতে শুরু হওয়ায় এর প্রাচীন সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পূর্ণ অবহেলিত ও অজ্ঞাত অবস্থায় ছিল। নদী বিধৌত পলি মাটি দ্বারা গঠিত বাংলার অধিকাংশ ভূমিরূপ। বাংলার ভূমি গঠন নবীন হলেও লালমাই, মধুপুর ও বরেন্দ্র অঞ্চলের ভূমিরূপ প্রাচীনত্বের প্রমাণ বহন করে চলেছে। ঐতিহাসিক যুগপর্বের পূর্বে বাংলায় মানুষের বিচরণ ছিল প্রত্নতাত্ত্বিক সূত্রে আজ সে কথা প্রমাণিত। উৎখননে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তু বাংলার প্রাচীনত্ব নিয়ে নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের বেশ কিছু প্রত্নবস্তু বাংলার বিভিন্ন অঞ্চলে পাওয়া গিয়েছে। চট্টগ্রামের সীতাকুণ্ডে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরীভূত কাষ্ঠ নির্মিত অস্ত্র পাওয়া গিয়েছে।[১] ফেনীর ছাগলনাইয়া, ময়নামতির আনন্দ বিহার ও লালমাই পাহাড়, উয়ারী-বটেশ্বর হতে নবোপলীয় যুগের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছে। সম্প্রতি হবিগঞ্জ জেলার চুনারুঘাটের চাকলাপুঞ্জিতে একটি প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নতাত্ত্বিক অবস্থান জানা গিয়েছে এবং প্রস্তর যুগের হাতিয়ার সংগৃহীত হয়েছে।[২] প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে প্রস্তর নির্মিত বিভিন্ন প্রকৃতির হাতিয়ার পাওয়া গিয়েছে। বাংলাতে প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রত্নবস্তু পাওয়া গেলেও বিধিসম্মত কোনো খনন পরিচালিত না হওয়ায় এই বিষয়ে বিস্তৃত ও সঠিক বিবরণ দেওয়া সম্ভব নয়। তবে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে বাংলা সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে কিছুটা হলেও সমৃদ্ধ ছিল তার আভাস সংগৃহীত প্রত্নবস্তুর মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। প্রাগৈতিহাসিক যুগের মেগালিথিক সংস্কৃতির নিদর্শন বাংলাতে পরিলক্ষিত হয়। মৃতদেহ সৎকার বা সমাধিস্থ করার একটি বিশেষ রীতি হিসাবে মেগালিথিক সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছে। মৃতদেহ সৎকারে প্রচলিত

চিত্র ১: মেগালিথিক (মেনহির) নিদর্শন, নয়াগাঙ্গের পাড়, জৈন্তাপুর, সিলেট, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

বিভিন্ন পদ্ধতির মধ্যে মেগালিথিক প্রথা অন্যতম প্রাচীন একটি পদ্ধতি। মানব সভ্যতার ইতিহাসে স্থাপত্যিক নিদর্শনের মধ্যেও এর স্থান প্রাচীনতম হিসাবে বিবেচিত।

চিত্র ২: মেগালিথিক (ডলমেন) নিদর্শন, জয়ন্তশ্বরী মন্দিরের সম্মুখে, জৈন্তাপুর, সিলেট, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

মেগালিথিক শব্দটি গ্রিক শব্দ 'মেগাস' (Megas) অর্থ বিশাল/বৃহৎ এবং 'লিথিক' (Lithic) অর্থ পাথর। মেগালিথিক শব্দটির উৎপত্তিগত অর্থ হলো বৃহৎ প্রস্তর। সাধারণত প্রস্তরের আধিক্য আছে এমন দেশসমূহে এই নিদর্শনের উপস্থিতি বেশি দেখা যায়। এর বিভিন্ন প্রকরণ পরিলক্ষিত হয় । মূলত ভারতীয় উপমহাদেশে মেগালিথিক সংস্কৃতির সূচনা হয় নবোপলীয় যুগে।[৩] বর্তমান বাংলাদেশে সিলেট জেলার জৈন্তাপুরে এই নিদর্শনের উপস্থিতি দেখা যায়। মেগালিথিক নিদর্শন সিলেট-জাফলং সড়কের পাশে জৈন্তাপুর নামক স্থানে অবস্থিত।[৪] বাংলাদেশের আর কোথাও এ সংস্কৃতির উদাহরণ পাওয়া যায় না। বেলে পাথরে নির্মিত এই নিদর্শনের দু'টি ধরন এখানে লক্ষ করা যায়। একটি খাঁড়া অমসৃণ প্রস্তর খণ্ড মাটিতে গ্রথিত অবস্থায় বিদ্যমান (চিত্র ১)। এই ধরনটি মেনহির নামে পরিচিত। অপরটি বেঞ্চ বা টেবিলের ন্যায় প্রস্তর খণ্ড দ্বারা গঠিত এবং নিম্নে প্রস্তরের খণ্ড দ্বারা পায়ার আকৃতি দেওয়া হয়েছে (চিত্র ২)। এ প্রকৃতির নিদর্শন সাধারণত ডলমেন নামে পরিচিত। নির্মাণের পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তা ঠিক বোধগম্য নয়। প্রচলিত আছে প্রাচীনকালে রাজাগণ বিচার কার্য পরিচালনা বা ক্লান্তপথিকের বিশ্রাম নেওয়ার জন্য প্রস্তর নির্মিত মেগালিথিক নিদর্শন গড়ে তুলতো। তবে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে প্রাগৈতিহাসিক পর্বে মৃতদেহ চাপা দেওয়ার ক্ষেত্রে ও সৎকারের পর জায়গাটি চিহ্নিতকরণের ক্ষেত্রে প্রস্তর খণ্ড খাঁড়া করে পুতে রাখা হতো বলে জানা যায়।

ঐতিহাসিক পর্বে প্রাচীন বাংলা স্থাপত্যিক ঐতিহ্যে সমৃদ্ধ ছিল। এই সময়ের কোনো ইমারত আদি অবস্থায় টিকে আছে এমন উদাহরণ পাওয়া যায় না। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ ধারণা প্রদান করে। মৌর্য, শুঙ্গ, কুষাণ যুগে বাংলার ইতিহাস সম্পর্কে তেমন কিছু জানা সম্ভব হয়নি। মৌর্য যুগে সম্রাট অশোকের রাজত্বকালের একটি শিলালিপি ও শুঙ্গ যুগের পোড়ামাটির ফলক মহাস্থানগড় খননে পাওয়া গিয়েছে। মূলত এই মৌর্য যুগ হতে বাংলায় নগর সভ্যতার যাত্রা শুরু হয়। শিল্পকলার ইতিহাসে গুপ্ত

যুগের খ্যাতি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। এই বিশেষ খ্যাতিই গুপ্ত যুগকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে স্বর্ণযুগ হিসাবে অভিহিত করেছে। গুপ্ত যুগে বাংলা শিল্পকলায় একটি পরিণত রূপ পরিগ্রহ করেছিল যা প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রমাণিত হয়েছে। গুপ্ত যুগে সূচিত সাংস্কৃতিক জাগরণের ধারা পাল ও সেন যুগে অব্যাহত ছিল। বাংলা গুপ্ত সাম্রাজ্যের একটি অংশে পরিণত হয়েছিল। পুণ্ড্রনগর তাদের গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক কেন্দ্র ছিল। লিপি সূত্রে ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে এই নগরীর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায়। গুপ্ত যুগের শেষ পর্বে বাংলার দক্ষিণ পূর্ব বঙ্গে স্বাধীন রাজ্যের প্রমাণ বহন করে কোটালিপাড়ার শিলালিপি। বর্তমান গোপালগঞ্জ জেলার কোটালিপাড়া গ্রামে প্রাপ্ত লিপিতে তিনজন শাসকের নাম উৎকীর্ণ আছে। খ্রিস্টীয় ছয় শতকে তারা কোটালিপাড়া হতে বঙ্গ প্রদেশ শাসন করতো। গুপ্তোত্তর পর্বে গৌড় নগরীকে কেন্দ্র করে শশাঙ্ক স্বাধীন সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। শশাঙ্কের পর বাংলায় রাজনৈতিক অরাজকতা বিরাজমান ছিল। সমতট অঞ্চলে এই সময়ে দেব বংশের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। তাম্রলিপিতে ও প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে তাদের শাসনামলের গুরুত্বপূর্ণ তথ্য জানা যায়। ময়নামতি-লালমাই অঞ্চলকে কেন্দ্র করে তাদের শাসনকার্য পরিচালিত হয়েছিল। মাৎস্যন্যায় যুগের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় পাল রাজবংশের উত্থান ঘটে। পাল রাজাদের শাসনামলে বাংলায় সাংস্কৃতিক উন্নয়নে স্থাপত্যশিল্পের বিকাশ বিশেষ গুরুত্ব বহন করে। বাংলায় বিহার স্থাপত্য নির্মাণে তাদের সমকক্ষ কোনো শক্তির পরিচয় পাওয়া যায় না। বিহারের মধ্যে নালন্দা বিহার, নওগাঁর সোমপুর বিহার পাল রাজাদের সময়ে নির্মিত বৌদ্ধ সংস্কৃতির সোনালি অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে। পাল বংশীয় শাসকদের দূর্বলতার সুযোগ নিয়ে কর্ণাটক থেকে আগত সেন বংশীয়রা বার শতকে বাংলার রাজ ক্ষমতা দখল করে নিয়েছিল। সেন শাসকরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী ছিল। তাদের আগমনে ধর্মীয় দিকের পাশাপাশি স্থাপত্য নির্মাণের ক্ষেত্রে পরিবর্তন সূচিত হয়। মন্দির স্থাপত্যের বিকাশ এ সময়ে হয়েছিল যা শিলালিপি, তাম্রলিপি ও প্রত্নতাত্ত্বিক খননে ধারণা পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যিক ঐতিহ্য চীনা পরিব্রাজক ফা-হিয়েন, হিউয়েন সাঙ ও ইৎসিঙ এর বিবরণীতে ফুটে উঠলেও আজও তা চিহ্নিত করা ও খনন পরিচালনা করা সম্ভব হয়নি। হিউয়েন সাঙ সমতটে এসেছিলেন এবং তিনি ত্রিশটিরও অধিক বৌদ্ধ বিহার এবং একশতের অধিক দেবমন্দিরের কথা উল্লেখ করেছেন।[৫] বিশ শতকের শেষ দশকে শুরু হওয়া প্রত্নতাত্ত্বিক খনন বর্তমানে চালু থাকলেও মাত্র কয়েকটি প্রত্নস্থলে আংশিক খনন পরিচালিত হতে দেখা যায়। মহাস্থানগড়, ময়নামতি, পাহাড়পুর, ভিতরগড়, উয়ারী-বটেশ্বর, ভরত ভায়না, বিক্রমপুর বিহার, সাভার, রোয়াইল বাড়ি দুর্গ প্রভৃতি স্থানে খনন পরিচালনা করে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্য, সমাজ ও সংস্কৃতি সম্পর্কে একটি ধারণা পাওয়া গিয়েছে। প্রাক মুসলিম আমলে বাংলায় নির্মিত ইমারতে নির্মাণ উপাদান হিসাবে ইটের আধিক্য দেখা যায়। তবে ইটের পাশাপাশি প্রস্তরের ব্যবহার প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যে লক্ষ করা যায়। স্থাপত্যের অলঙ্করণে পোড়ামাটির ফলকের প্রাধান্য থাকলেও প্রস্তর ভাস্কর্যের উপস্থিতি একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। প্রাচীনযুগে বাংলায় ধর্মীয় ও লৌকিক স্থাপত্য নির্মাণের প্রমাণ পাওয়া যায়। বিহার স্থাপত্যের আধিক্য থাকলেও বিভিন্ন প্রকৃতির স্থাপনা বাংলায় পরিলক্ষিত হয়। প্রাচীনযুগে বাংলায়

নির্মিত স্থাপত্য সম্পর্কে উৎখনন, লিপি এবং সাহিত্য সূত্রে একটি ধারণা পাওয়া যায়। এই সময়ে বাংলায় নির্মিত ইমারতের মধ্যে ধর্মীয় স্থাপনার আধিক্য বিশেষভাবে লক্ষণীয়। প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যকে কয়েকটি ভাগে বিভক্ত করা যায়। যেমন-

ক. স্তূপ
খ. বিহার
গ. মন্দির
ঘ. স্তম্ভ
ঙ. দুর্গ ও দুর্গ নগরী
চ. প্রাসাদ/রাজবাড়ি/আবাসগৃহ
ছ. পাকা সড়ক, সেতু, কূপ প্রভৃতি।

নিম্নে প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যের প্রকরণের উপরে উল্লেখিত বিভিন্ন দিকগুলোর উপর আলোকপাত করা হলো-

ক. স্তূপ

বাংলার প্রাচীন স্থাপত্যে স্তূপ একটি বিশেষ স্থান দখল করে আছে। স্তূপ নির্মাণের প্রাচীনতম নিদর্শন পাওয়া যায় সম্রাট অশোকের সময়ের।[৬] খড়্গ বংশীয় শাসকদের আমলে ব্রোঞ্জের তৈরি একটি স্মারক স্তূপ বাংলাতে পাওয়া যায়, যা প্রাপ্ত স্তূপের মধ্যে সর্বপ্রাচীন বলে বিবেচনা করা হয়।[৭] বৌদ্ধ ধর্মের সঙ্গে সম্পর্কিত এই ইমারত নির্মাণের পেছনে কয়েকটি উদ্দেশ্য জড়িত ছিল। বিভিন্ন উৎস হতে জানা যায় স্তূপের তিনটি প্রধান ভাগ রয়েছে; যথা-

১. স্মৃতি চিহ্ন স্তূপ
২. স্মারক স্তূপ
৩. উপাসনা স্তূপ।[৮]

চিত্র ৩: প্রস্তরে নির্মিত স্তূপ,
আনু. নয় শতক, রাজশাহী

সৌজন্য: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

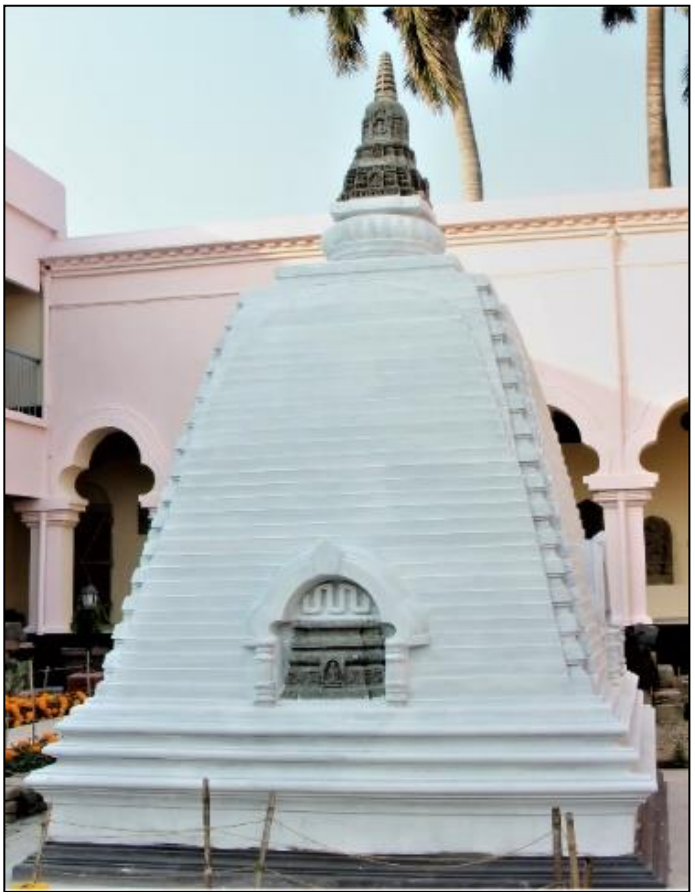

চিত্র ৪: প্রস্তরে নির্মিত স্তূপ, বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।
সৌজন্য: বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘর, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

১. স্মৃতি চিহ্ন স্তূপ: গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর প্রধান অনুসারীদের দেহ বা এর অংশ বিশেষের উপর নির্মিত নিদর্শন স্মৃতি চিহ্ন স্তূপ হিসাবে বিবেচিত। সাধারণত পরিনির্বাণের পর দেহ ভস্মের কোনো বস্তু সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্মৃতি চিহ্ন স্তূপ নির্মাণ করা হতো। এই স্তূপ নির্মাণে আরাধনার বিষয়টি জড়িত ছিল।

২. স্মারক স্তূপ: গৌতম বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্যগণের জীবন ও কর্মের সাথে জড়িত দ্রব্যাদি সংরক্ষণের উদ্দেশ্যে স্মারক স্তূপ নির্মিত হতো। মূলত বুদ্ধ ও তাঁর প্রধান শিষ্যদের স্মৃতি রক্ষার্থে স্মারক স্তূপ গড়ে উঠেছিল। তাঁর জীবন ও বাণীর প্রতি সম্মান প্রদর্শনের জন্যই

স্মারক স্তূপ নির্মাণ করা হতো। এই স্তূপ নির্মাণের পেছনেও আরাধনার বিষয়টি জড়িত ছিল।

৩. উপাসনা স্তূপ: গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি বিজড়িত স্থানসমূহকে গুরুত্ব প্রদানের জন্য উপাসনা স্তূপ নির্মাণ করা হতো। গৌতম বুদ্ধ ও ধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত স্থানে উপাসনার উদ্দেশ্য নিয়ে স্তূপ গড়ে উঠেছিল। এছাড়াও বহনযোগ্য নিবেদন স্তূপের উদাহরণ পাওয়া যায়।

প্রাচীনযুগে স্তূপ বৌদ্ধ ধর্মের অন্যতম প্রতীকে পরিণত হয়েছিল। বিভিন্ন সূত্রে প্রাচীন বাংলায় স্তূপ স্থাপত্যের বিকাশ সম্পর্কে জানা গেলেও খননে সামান্যই উদঘাটন করা সম্ভব হয়েছে। বৌদ্ধ বিহারের সাথে স্তূপ স্থাপত্যের উপস্থিতি বেশি পরিলক্ষিত হয়। বাংলাতে স্তূপ নির্মাণে ইটের প্রধান্য দেখা যায়। ইটের পাশাপাশি প্রস্তর ও ধাতু নির্মিত স্তূপের উদাহরণ এখানে পাওয়া গিয়েছে। বর্গাকার, অষ্টভুজাকার, বৃত্তাকার ও ক্রুশাকার ভিতের উপর স্তূপ নির্মিত হতো। সোমপুর মহাবিহারে খনন পরিচালনা করে বেশকিছু স্তূপের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। মহাবিহার সংলগ্ন সত্যপীরের ভিটা নামক স্থাপনা খননে স্তূপের আধিক্য দেখা যায়। ১৩২ টি স্তূপ সত্যপীরের ভিটায় অবস্থিত যা মন্দিরের গুরুত্বকে বৃদ্ধি করেছে বলে ধারণা করা যায়।[৯] বিভিন্ন ধরন ও আকৃতির স্তূপ এখানে দেখা যায়। ময়নামতি-লালমাই অঞ্চল খননে বেশ কয়েকটি স্তূপের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।[১০] শালবন বিহারে একটি ব্রোঞ্জের নিবেদন স্তূপ ও কুটিলা মুড়াতে ইট নির্মিত অলঙ্কৃত তিনটি স্তূপের উপস্থিতি দেখা যায়। খ্রিস্টীয় সাত শতকে কুটিলা মুড়ার স্তূপ তিনটি নির্মিত হয়েছিল বলে ধারণা করা হয়। মহাস্থানগড় ও এর আশেপাশে বেশ কয়েকটি স্তূপ/ধাপ খননে চিহ্নিত করা সম্ভব হয়েছে। বাংলাদেশ জাতীয় জাদুঘরে কালো পাথরে নির্মিত নয় শতকের একটি স্তূপ সংরক্ষিত আছে (চিত্র ৩)। বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘরে বিভিন্ন প্রকৃতির নিবেদন স্তূপ দেখা যায় (চিত্র ৪)। বাংলাতে বৌদ্ধ ধর্মের জাগরণ পর্বে স্তূপ স্থাপত্য প্রাধান্য পেয়েছিল যা খননে আজ প্রমাণিত হয়েছে।

খ. বিহার

প্রাচীন বাংলার স্থাপত্যিক ঐতিহ্য বহন করে মূলত বিহার স্থাপনাসমূহ। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাচীন বাংলার আবিষ্কৃত ইমারতের মধ্যে সর্বাধিক বৈশিষ্ট্যপূর্ণ ও তাৎপর্যবাহী হলো বিহার বা মঠ নিদর্শন। এই স্থাপনা প্রাচীন বাংলার সমাজ-সংস্কৃতির আলোকময় অধ্যায়ের সাক্ষ্য বহন করে। বিহার শব্দটি বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ হতে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। বিহার হলো গৃহত্যাগী সন্ন্যাসীর আশ্রম ও মঠ যার সমার্থক শব্দ হলো বিহার, আরাম, সংঘারাম প্রভৃতি।[১১] প্রার্থনার উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়ার স্থান বিশেষকে বিহার হিসাবে ব্যাখ্যা করা যায়। বাংলাতে আবিষ্কৃত বিহার স্থাপত্যের ভূমি পরিকল্পনা হতে সহজেই অনুধাবন করা যায় যে আবাসিক শিক্ষালয় হিসাবে বিহারসমূহ নির্মিত হয়েছিল। অর্থাৎ ধর্মীয় শিক্ষার পাশাপাশি অন্যান্য শিক্ষা প্রদানের জন্য এই স্থাপনা গড়ে তোলা হয়েছিল। বর্তমানে আবাসিক বিশ্ববিদ্যালয়ের আদলে প্রাচীন বাংলার বিহারসমূহ নির্মিত হয়েছে। রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর এ বিহার নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য প্রদান করেছেন।[১২] বিহার নির্মাণে আগুনে পোড়ানো ইটের ব্যবহার দেখা যায়। তবে ইটের সাথে প্রস্তরের ব্যবহারও বিহারে পরিলক্ষিত হয়। বিহারের গাত্র অধিকাংশই পোড়ামাটির ফলক দ্বারা অলঙ্কৃত। খননে প্রাপ্ত পোড়মাটির শিল্পে সমকালীন বাংলার সমাজ ও সংস্কৃতির বিভিন্ন দিক ফুটিয়ে তোলা হয়েছে। প্রস্তর ভাস্কর্যেও বুদ্ধকে বিভিন্ন রূপে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। বিহারসমূহ প্রায় বর্গাকার পরিকল্পনায় নির্মাণ করা হতো। এর চারদিকে সুউচ্চ ও প্রশস্ত বেষ্টনী প্রাচীরে ছোট ছোট কক্ষ সমন্বয়ে মাঝখানে ক্রুশাকার ভূমি নকশাতে মূল উপাসনা কেন্দ্রটি গড়ে উঠত। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণী হতে জানা যায়, তিনি বাংলার পুণ্ড্রনগরে এসেছিলেন এবং ৮০০ মাইল (৪০০০ লি) পরিবেষ্টিত এই রাজ্যে বৃহৎ বিশটি সংঘারামে তিন হাজার বৌদ্ধ ভিক্ষুর বাস ছিল।[১৩]

চিত্র ৫: সোমপুর মহাবিহার, নওগাঁ, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বাংলায় বেশ কয়েকটি বিহারের ধ্বংসাবশেষ সনাক্ত করা সম্ভব হয়েছে। এগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো- ১. রাজশাহী জেলার বিহারৈল বিহার, ২. নওগাঁর সোমপুর বিহার (চিত্র ৫), জগদ্দল বিহার, হলুদ বিহার, ৩. দিনাজপুরের সিতাকোট বিহার, ৪. ময়নামতি-লালমাইয়ে শালবন বিহার, আনন্দ বিহার, ভোজ বিহার, ইটাখোলা বিহার, রূপবান বিহার, কোটবাড়ি বিহার, ৫. মহাস্থানগড়ের ভাসুবিহার, ৬. যশোরের ভরত ভায়না, ৭. সাভার বিহার, ৮. বিক্রমপুর বিহার, ৯. গাইবান্ধার বোগদহ বিহার।

চিত্র ৬: পোড়ামাটির ফলকে মন্দিরের কাঠামো, সৌজন্য: বরেন্দ্র গবেষণা জাদুঘর, রাজশাহী, ছবি: মো. মিন্টু

গ. মন্দির

প্রাচীনযুগে বাংলায় মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যায় তাম্রলিপি, শিলালিপি, সাহিত্য ও প্রস্তর ভাস্কর্য হতে। হিউয়েন সাঙ এর বিবরণী হতে বিহারের ন্যায় মন্দির স্থাপনা সম্পর্কে জানা যায়। মৌর্যযুগ হতে সেনযুগ পর্যন্ত বাংলায় নির্মিত কোনো মন্দির আজ আদিরূপ নিয়ে টিকে নেই।[১৪] গুপ্ত যুগে বাংলায় মন্দির স্থাপত্যের সূচনা ও বিকাশ হয়েছিল।[১৫] প্রত্নতাত্ত্বিক খননে বিহারের মাঝখানে নির্মিত স্থাপনা মন্দির হিসাবে চিহ্নিত। মন্দির শব্দের অর্থ হলো ঘর। যে ঘরে মূর্তি রেখে পূজা বা উপাসনা করা হতো তাই মন্দির নামে খ্যাতি লাভ করে। হিন্দু ধর্মের প্রধান ধর্মীয় প্রার্থনাগার মন্দির নামে পরিচিত।

প্রাচীন বাংলায় হিন্দু, বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মাবলম্বীদের উপাসনার জন্য নির্মিত স্থাপনা মন্দির নামে পরিচিতি পেলেও বৌদ্ধদের উপাসনালয় মূলত বৌদ্ধ মঠ বা বিহার নামে খ্যাত। মন্দিরের ধ্বংসাবশেষ বা প্রতীকী মন্দিরের নকশা অধিকাংশই পশ্চিমবঙ্গে পাওয়া গিয়েছে। বিভিন্ন জাদুঘরে সংরক্ষিত প্রতীকী মন্দির হতে ও ধ্বংসপ্রাপ্ত মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা হতে প্রাচীন বাংলার মন্দির স্থাপত্য সম্পর্কে একটি ধারণা লাভ করা যায় (চিত্র ৬)। মন্দিরের ভূমি পরিকল্পনা প্রায় একই প্রকৃতির এবং এক কক্ষ বিশিষ্ট হতো। মন্দিরের উপরের অংশের স্থাপত্যিক শৈলী দ্বারা এর বিভাজন লক্ষ করা যায়। রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীহাররঞ্জন রায়, সরসীকুমার সরস্বতী এবং আ. কা. মো. যাকারিয়া প্রমুখের বিবরণে নির্মাণরীতির দিক দিয়ে মন্দিরের চারটি ভাগের উল্লেখ পাওয়া যায়। তাদের বিবরণে যে চার রকমের মন্দিরের নাম এসেছে তা হলো- ১. ভদ্র বা পীড় পদ্ধতি, ২. রেখা বা শিখর পদ্ধতি, ৩. স্তূপযুক্ত ভদ্র পদ্ধতি ও ৪. শিখর বিশিষ্ট ভদ্র পদ্ধতি।[১৬] মন্দিরের অলঙ্করণে পোড়ামাটির ফলক প্রাধান্য পেলেও প্রস্তর খোদিত বিভিন্ন দেবদেবীর উপস্থিতি বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

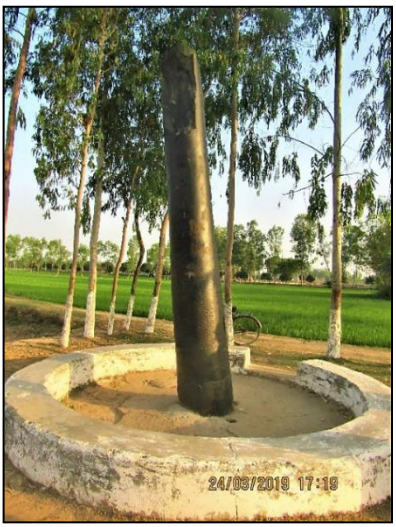

চিত্র ৭: গরুড় স্তম্ভ, নওগাঁ, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

ঘ. স্তম্ভ

প্রাচীন বাংলায় স্তম্ভ নিদর্শন নির্মাণের পরিচয় পাওয়া যায় পাল ও সেন আমলে। এর পূর্বে নির্মিত কোনো স্তম্ভের সন্ধান পাওয়া যায় নি। বিভিন্ন সূত্রে জানা যায়, সম্রাট অশোক তাঁর শাসনামলে কয়েকটি স্তম্ভ নির্মাণ করেছিলেন। স্তম্ভ নির্মাণের পেছনে কী উদ্দেশ্য ছিল তা ঠিক বোধগম্য নয়। তবে ধারণা করা যায়, কোনো অঞ্চল জয়ের পর স্মৃতি চিহ্ন হিসাবে স্তম্ভ গড়ে তোলা হতো। লিপি সংযুক্ত স্তম্ভ হতে নির্মাণের বিষয়ে সহজেই জ্ঞাত হওয়া যেত। সাধারণত স্তম্ভসমূহ নির্মাণে প্রস্তর ব্যবহার করা হতো। বর্তমান বাংলাদেশের নওগাঁ জেলায় দু'টি প্রস্তর স্তম্ভের সন্ধান পাওয়া যায়। এর একটি ধামইরহাট উপজেলার মঙ্গলবাড়ি নামক স্থানে অবস্থিত যা গরুড় স্তম্ভ (চিত্র ৭) নামে পরিচিত এবং অপরটি দিবর দিঘি স্তম্ভ (চিত্র ৮) যা পত্নীতলা উপজেলাতে অবস্থিত।[১৭] প্রস্তরে নির্মিত স্তম্ভ দু'টি প্রাচীন বাংলার বিশেষ রীতির নিদর্শন হিসাবে গুরুত্ব বহন করে।

চিত্র ৮: দিবর দিঘির প্রস্তর স্তম্ভ, নওগাঁ, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

ঙ. দুর্গ ও দুর্গ নগরী

প্রাচীন বাংলার লৌকিক স্থাপত্যের মধ্যে দুর্গ বিশেষ স্থান দখল করে আছে। কোনো নগরী গড়ে তোলা হলে সুরক্ষার প্রয়োজনে দুর্গ নির্মাণ করা হতো। তবে দুর্গ গড় নামেও পরিচিত। উৎখননে প্রাচীন বাংলার বেশ কিছু দুর্গ ও দুর্গ নগরীর ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। দুর্গ নির্মাণে কাদামাটি, আগুনে পোড়ানো ইট এবং ক্ষেত্র বিশেষে প্রস্তরের ব্যবহার দেখা যায়। পশ্চিমবঙ্গের পাণ্ডু রাজার ঢিবি, চন্দ্রকেতুগড়, বানগড়, আসুরগড়, নলরাজারগড় প্রভৃতি স্থানে খননে দুর্গের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে। বাংলায় বিভিন্ন প্রত্নস্থলে খনন পরিচালনা করে দুর্গ ও দুর্গনগরীর অস্তিত্ব সম্পর্কে জানা যায়। বাংলাদেশে প্রাপ্ত এই নিদর্শনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো মহাস্থানগড়, ভিতরগড়, কোটালীপাড়া দুর্গ, বিক্রমপুরের গড়, সাভার দুর্গ, ঘোড়াঘাট দুর্গ, ধর্মগড়। মূলত দুর্গনগরী সুরক্ষিত আবাসসহ এবং কিছু দুর্গ শুধু সেনানিবাস হিসাবে নির্মিত হয়েছিল।

চ. প্রাসাদ/রাজবাড়ি/আবাসগৃহ

প্রাচীনযুগে নির্মিত প্রাসাদ বা রাজবাড়ির উদাহরণ তেমন পাওয়া যায় না। ধর্মীয় ইমারত নির্মাণে শাসকগণ যতটা মনোযোগী ছিলেন নিজেদের বসবাসের জন্য আবাস নির্মাণে হয়তোবা ততটা আগ্রহী ছিলেন না। প্রত্নতাত্ত্বিক খননে প্রাচীন বাংলার বিভিন্ন প্রকৃতির ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে; কিন্তু কোনো বৃহৎ প্রাসাদের উপস্থিতি এখনও উদঘাটিত হয়নি। সম্ভবত ইট, পাথরে কোনো বৃহৎ ইমারত শাসকগণ বসবাসের জন্য নির্মাণ করেনি। সে সময়ে গৃহ নির্মাণের যে প্রযুক্তি ছিল তা তারা গ্রহণ করেছিল নিজেদের আবাস নির্মাণে। তারপরও মহাস্থানগড়ে রাজা পরশুরামের প্রাসাদ নামে একটি ঢিবি চিহ্নিত করা হয়েছে। লালমাই-ময়নামতি পাহাড় শ্রেণির উত্তর পাশে রাণী ময়নামতির প্রাসাদ খ্যাত একটি ইমারতের ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। রাণীর বাংলো নামেও এই ঢিবিটি পরিচিত। দেবপর্বত এখানে অথবা এর আশেপাশেই অবস্থিত।[১৮] খড়্গ বংশীয় শেষ শাসক বলভট্টের জয়স্কন্ধাবার দেবপর্বতে কটকশিলা প্রাসাদের নাম পাওয়া যায়।[১৯] শালবন বিহারে প্রাপ্ত খড়্গ বংশীয় তৃতীয় নির্মাণ যুগের তাম্রলিপিতে রাজপুত্র বলভট্টের নাম উল্লেখিত আছে।[২০] সেন রাজাদের সময়ে বল্লালবাড়ি নামে পরিচিত দু'টি আবাসগৃহের সন্ধান পাওয়া গিয়েছে।

চিত্র ৯: গোরকই কূপ, ঠাকুরগাঁও, ছবি: মো. মিন্টু আলী বিশ্বাস।

বর্তমান মুন্সিগঞ্জ জেলার বিক্রমপুরে ও গৌড়ে এই আবাসগৃহ অবস্থিত। ক্ষুদ্র পরিসরে দুর্গের অভ্যন্তরে এই ইমারত গড়ে তোলা হয়েছে।

ছ. পাকা সড়ক, সেতু ও কূপ

নদ-নদী দ্বারা বেষ্টিত প্রাচীন বাংলায় চলাচলে নৌকা ও নৌপথের ব্যবহার বেশি হতো। ফলে নদীর কাছাকাছি অধিকাংশ স্থাপত্য নিদর্শন গড়ে উঠেছিল। সড়কপথের ব্যবহার সে সময়ে কম ছিল। পাকা সড়কের অস্তিত্ব খুব একটা পাওয়া যায় না। উয়ারী-বটেশ্বর খননে একটি পাকা রাস্তার সন্ধান পাওয়া গেলেও তা খুব দীর্ঘ নয়। কোটালীপাড়া দুর্গে ইটের তৈরি পাকা সড়ক লক্ষণীয়। সম্ভবত ঘাগড় নদী পর্যন্ত সংযোগকারী হিসাবে সড়কটি নির্মিত হয়েছিল। ইট বিছানো পাকা রাস্তার দীর্ঘতম উদাহরণ পাওয়া যায় নওগাঁ জেলার পাহাড়পুর বিহার হতে হলুদ বিহার পর্যন্ত; যা প্রায় পনের কিলোমিটার দীর্ঘ। মধ্যযুগে বাগেরহাট ও বারোবাজারে এরূপ সড়কের ব্যবহার দেখা যায়। সিতাকোট বিহারের সাথেও পাকা সড়কের অস্তিত্ব পাওয়া গিয়েছে। এছাড়াও ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি পাকা সড়কের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। পাকা সেতুর উদাহরণ প্রাচীন বাংলাতে পাওয়া যায় না। তবে বর্তমান জয়পুরহাট জেলার পাথরঘাটা নামক স্থানে তুলসীগঙ্গা নামক নদীর উভয় পাশে প্রস্তরে নির্মিত সেতুর ধ্বংসাবশেষ পরিলক্ষিত হয়।[২১] ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা অলঙ্কৃত প্রস্তরসমূহ প্রাচীন ও মধ্যযুগের স্মৃতি বহন করে। এ অঞ্চল হতে প্রাপ্ত মসৃণ মৃৎপাত্র ও ভগ্ন কুষাণ রীতির রমণীর মস্তক আদি ঐতিহাসিক পর্বের মানব বসতির সাক্ষ্য বহন করে।[২২] খনন পূর্ব এ অঞ্চলের প্রত্ননিদর্শন সম্পর্কে সঠিক ধারণা প্রদান করা সম্ভব নয়। প্রাচীনযুগে বাংলায় পাকা কূপের (চিত্র ৯) অস্তিত্ব খুব বেশি ছিল না। মহাস্থানগড়, পাহাড়পুর খননে পাকা কূপের পরিচয় পাওয়া যায়। কূপের পাশাপাশি জলাশয় খননের প্রমাণ মেলে বিভিন্ন তাম্রলিপিতে। মহাস্থানগড়ে পুকুরে পাকা পাড় বাঁধানো ঘাটের সন্ধান পাওয়া গেছে।

পরিশেষে বলা যায়, প্রাচীন বাংলা প্রত্ন-স্থাপত্যে সমৃদ্ধ ছিল, যার খুব সামান্যই আজ বিদ্যমান। প্রাচীন বাংলায় প্রাপ্ত ঐতিহ্য বহনকারী ইমারতসমূহ ও প্রত্নবস্তু বাংলার ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আকর সূত্র হিসেবে বিবেচিত। বৈচিত্র্যময় প্রত্ন-স্থাপত্যের ওপর নির্ভর করে প্রাচীন বাংলার প্রাচীনত্ব, ইতিহাস-ঐতিহ্য কিছুটা হলেও তুলে ধরা সম্ভব হয়েছে। প্রাচীন বাংলার শিল্প চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম হিসেবেও স্থাপত্য শিল্পকে উল্লেখ করা যায়। বাংলার প্রচলিত ধর্মমতের প্রভাব এ অঞ্চলে নির্মিত ইমারতে প্রতিফলিত হয়েছিল। মূলত ধর্মীয় পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করে প্রত্ন-স্থাপত্যসমূহ। স্তূপ ও বিহারসমূহ বাংলায় বৌদ্ধ ঐতিহ্যের ধারক। বিহারের মাঝখানে ক্রুশাকার মন্দির নির্মাণ ব্রাহ্মণ্য ও বৌদ্ধ ধর্মের সহাবস্থানকে নিশ্চিত করেছে। সুরক্ষিত দুর্গ বেষ্টিত নগরের উদাহরণ একদিকে যেমন অর্থনৈতিক সমৃদ্ধির পরিচায়ক, তেমনি উন্নত নির্মাণকৌশল, গঠন ও স্থাপত্যিক বৈশিষ্ট্যের ধারণা প্রদান করে। দুর্গ প্রাচীরের ভিতরে ধর্মীয় ইমারতসহ লৌকিক ইমারতের ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কৃত হয়েছে। ইমারত নির্মাণে উপাদান হিসেবে পলিমাটির বাংলায়

আগুনে পোড়ানো ইটের পাশাপাশি প্রস্তরের ব্যবহার পরিলক্ষিত হয়। অথচ বাংলায় প্রস্তর পাওয়া যায় না বললেই চলে। বিহারের রাজমহল হতে প্রস্তর বাংলায় আমদানি করা হতো।[২৩] অলঙ্করণের ক্ষেত্রে পোড়ামাটির ফলক ও প্রস্তর খোদাই শৈলীর ব্যবহার লক্ষণীয়। অলঙ্করণ শৈলীতে প্রাচীন বাংলার জীব বৈচিত্র্য, প্রকৃতি-পরিবেশ, দেব-দেবী, প্রত্ন স্থাপত্যের অনুকৃতিসহ সামাজিক-সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ফুটে উঠেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান, আবিষ্কার এবং সাহিত্যিক সূত্র হতে প্রাচীন বাংলার গৌরবময় এ অধ্যায়ের যে পরিচয় পাওয়া সম্ভব হয়েছে তা হতে প্রত্ন-ইমারতের বিভিন্ন প্রকরণ সম্পর্কেও একটি ধারণা পাওয়া যায়। প্রাচীন বাংলার সমাজ, সংস্কৃতি, ধর্ম এবং অর্থনৈতিক অবস্থার একটি চিত্রও প্রত্ন-স্থাপত্যের মধ্য দিয়ে ফুটে উঠেছে। ইমারত নির্মাণে ব্যবহৃত উপকরণ, কলা-কৌশল হতে প্রাচীন বাংলার ভৌগোলিক অবস্থা, স্থাপত্যিক রীতি সম্বন্ধে সীমিত ধারণার পাশাপাশি অলঙ্করণ শৈলীতে সাংস্কৃতিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় অবহিত করেছে যা অনুপুঙ্খ বিশ্লেষণে প্রতীয়মান হয়েছে।

টীকা ও তথ্যসূত্র

১. শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *বাঙ্গালার ইতিহাস*, প্রথম খণ্ড (কলিকাতা: মনোমোহন প্রকাশনী, দ্বিতীয় সংস্করণ ১৯৬০), ৭

২. M. M. Hoque, S. M. K. Ahsan & S. Pawanker, "Prehistory of Chunarughat and Sylhet: A Preliminary Study", Sharif Uddin Ahmed (ed.), *Sylhet: History and Heritage* (Dhaka: Bangladesh Itihas Samiti, 1999), 83-90; J. S. Roy & S. M. K. Ahsan, 'A Study of Prehistoric Tools on Fossil Wood from Chaklapunji, Hobiganj', *Pratnatatta, Journal of the Archaeology Department*, Jahangirnagar University, vol. 6, 2000, 21-32

৩. S. N. Rao, "Megalithic Practices among Khasis and Nagas of North-east India", J. P. Sing & G. Sengupta (ed.), *Archaeology of North-eastern India* (India: New Delhi, 1991), 105-125

৪. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য

৫. শ্রীরাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত*, ৯১; Thomas Watters, *On Yuam Chwang's Travels in India*, vol. 2 (London: Royal Asiatic Society, 1905), 190

৬. গনপতি সুব্বিয়াহ্ ও ভি. পি. রিমাইয়া, "স্থাপত্য", আবদুল মোমিন চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস; আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯), ৪২৪

৭. Md. Mosharraf Hossain (ed.), The Archaeological Heritage of Bangladesh by Dr. A.K.M. Zakaria (Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh, 2011), 28

৮. এ. বি. এম. হোসেন (সম্পা.), *স্থাপত্য*, *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা*-২ (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০০৭), ২৫

৯. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য

১০. গনপতি সুব্বিয়াহ্ ও ভি. পি. রিমাইয়া, *প্রাগুক্ত*, ৪২৬

১১. Bimala Churn Law, *Early Indian Monasteries* (Bangalore: Indian Institute of World Culture, 1957), 1

১২. 'বিশ্ববিদ্যালয় একটি বিশেষ সাধনার ক্ষেত্র। সাধারণভাবে বলা চলে, সে সাধনা বিদ্যার সাধনা, কিন্তু তা বললে কথাটা সুনির্দিষ্ট হয় না, কেননা বিদ্যা শব্দের অর্থ ব্যাপক এবং তার সাধনা বহু বিচিত্র। য়ুরোপীয় ভাষায় যাকে য়ুনিভার্সিটি বলে প্রধানত তার উদ্ভব য়ুরোপে। অথচ এ য়ুনিভার্সিটির প্রথম প্রতিরূপ একদিন ভারতবর্ষেই দেখা দিয়েছিল। নালন্দা, বিক্রমশীল ও তক্ষশীলার বিদ্যায়তন কবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তার নিশ্চিত কাল নির্ণয় এখনো হয়নি, কিন্তু ধরে নেওয়া যেতে পারে, য়ুরোপীয় য়ুনিভার্সিটির পূর্বেই তাদের আবির্ভাব।' দেখুন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিশ্ববিদ্যালয়ের রূপ', *শিক্ষা*, (কলিকাতা: বিশ্বভারতী গ্রন্থ বিভাগ, ১৩৮৯ বঙ্গাব্দ), ২০০-২০১

১৩. Thomas Watters, *op. cit.*, 184

১৪. গনপতি সুব্বিয়াহ্ ও ভি. পি. রিমাইয়া, *প্রাগুক্ত*, ৪৪৩

১৫. *প্রাগুক্ত*, ৪২২

১৬. আ. কা. মো. যাকারিয়া, *বাংলাদেশের প্রত্নসম্পদ* (ঢাকা: দিব্য প্রকাশ, ২০০৭), ২৯

১৭. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য।

১৮. Barre M. Morrison, *Lalmai, a Cultural Center of Early Bengal;an Archaeological Report and Historical Analysis* (Seattle: University of Washington Press, 1974), 107

১৯. আ. কা. মো. যাকারিয়া, 'সমতটের খড়্গ, নাথ ও রাত রাজবংশ', *আবু মহামেদ হবিবুল্লাহ স্মারকগ্রন্থ*, (ঢাকা: বাংলাদেশ ইতিহাস পরিষৎ, ১৯৯১), ৩৯; Kamala Kanta Gupta, 'Two Mainamati copper plate Inscriptions of the Khadga and early Deva Times', *Bangladesh Archaeology*, 1979, 141-143

২০. Barre M. Morrison, *Lalmai, a Cultural Center of Early Bengal;an Archaeological Report and Historical Analysis* (Seattle: University of Washington Press, 1974), 101

২১. বাস্তব পর্যবেক্ষণে প্রাপ্ত তথ্য

২২. Dilip Kumar Chakrabarti, *Ancient Bangladesh;A Study of the Archaeological Sources* (Dhaka: UPL, 1992), 51-53

২৩. Ahmed Hasan Dani, *Muslim Architecture in Bengal* (Dacca: Asiatic Society of Pakistan, 1961), 130; গৌড়েশ্বর ভট্টাচার্য, "প্রস্তর ভাস্কর্যের মূর্তিতত্ত্ব", আবদুল মোমিন চৌধুরী (সম্পা.), *বাংলাদেশের ইতিহাস; আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে আদি বাংলা (আনু. ১২০০ সা. অব্দ পর্যন্ত)*, দ্বিতীয় খণ্ড (ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি, ২০১৯), ৩৯৫